OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 64 - 69
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 64 - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মঙ্গলকাব্যে নৃত্যের প্রতিফলন

দেবরিমা চক্রবর্তী
Email ID: debarimadance@gmail.com
0009-0008-1294-0047

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Mangal-kavya, Dance in Bengali literature, Medieval Bengal, Dance, Folk traditions, Manasamangal, Chandimangal, Raibenshe dance, Performance culture, Socio-cultural history.

Abstract
This paper explores the significance of dance in medieval Bengali literature, particularly within the tradition of Mangal-kavya, a genre of narrative poetry composed between the 13th and 18th centuries. Drawing on the analysis of Kunal Chakrabarti, the study situates Mangal-kavya within a broader socio-cultural transformation—from orally transmitted folk narratives to later Brahmanised literary compositions that integrated local deities into the wider Puranic framework, thereby granting them religious and social legitimacy. The discussion contextualizes the rise of Mangal-kavya against the backdrop of the 13th-century Turkish invasions and the subsequent decline of Brahmanical dominance under the Sena rulers. This shift facilitated the growth of folk traditions, ritual practices, and oral literature, which were later textualized from the late 15th century onward. While the primary focus of these texts is the glorification of deities, they also provide valuable insights into contemporary social, cultural, and political life. Focusing on Manasamangal (particularly Bijay Gupta's version), the paper highlights the prominent role of dance, music, and performance within divine and human realms. Episodes such as the celestial dance of Aniruddha and Usha, and Behula's performance in the court of the gods, demonstrate that dance was not merely a form of entertainment but a respected and spiritually significant practice, capable of invoking divine favor and shaping narrative outcomes. The paper also references Jibanananda Das's poetic reimagining of Behula's dance to illustrate the continuity of this motif in modern Bengali literature, emphasizing dance as a medium of emotional expression and aesthetic experience. Further, through Chandimangal by Mukunda Chakraborty the study examines depictions of urban prosperity, cultural life, and martial traditions, including references to the folk martial dance Raibenshe. The transformation of such martial practices into performative traditions is discussed in light of the interpretations of Gurusaday Dutt. The study concludes that dance occupied a position of dignity and importance in earlier Bengali society, deeply embedded in religious, social, and cultural practices. Although its status fluctuated over time, its presence remained continuous. Therefore, Mangal-kavya serves as a crucial literary source for reconstructing the historical and cultural trajectory of dance in Bengal.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 64 - 69
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

মঙ্গলকাব্য ১৩শ থেকে ১৮শ শতকের মধ্যে রচিত দীর্ঘ আখ্যানধর্মী কবিতা, যেখানে বিভিন্ন লোকদেবতা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কাহিনীগুলি বহু প্রজন্ম ধরে মৌখিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল এবং ঘটনাগুলি প্রায়শই রচনার সময়কাল থেকে আগের কাহিনী বর্ণিত করে। কুনাল চক্রবর্তী অনুসারে, মঙ্গলকাব্য রচনার দুটি পর্যায় রয়েছে - ১) ১৩শ শতক থেকে প্রচলিত লোক আখ্যান ২) ১৫শ শতকের পর থেকে প্রতিভাবান কবিরা ব্রাহ্মন্যকরণের ছোঁয়া যোগ করেন, মূল কাহিনী অপরিবর্তিত রেখে - লক্ষ্য ছিল লোকদেবতাদের মধ্যে পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করা, যাতে তারা সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদা পায়।[১]

১৩শ শতকের তুর্কি আক্রমণে সেন রাজারা, যাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, নিম্নবর্গের জনগণের সমর্থন হারিয়েছিলেন। নতুন মুসলিম শাসকদের আগমনে উচ্চবর্ণের অহংকার ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ওপর প্রভাব কমে জায়, যার ফলে লোকধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও মৌখিক সাহিত্য বিকশিত হয়। এই সময় দেখা যায় যে পুরাণের দেবী দেবতাগণের সাথে লৌকিক দেবদেবীদের সংযোগ স্থাপন করে তাদের আখ্যান রচিত হয়েছে। প্রথমে এগুলি মৌখিকভাবে প্রচলিত থাকলেও, পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৫শ শতকের শেষ থেকে এগুলি লিখিত আকারে প্রকাশ পায়। দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথা বর্ণিত করে, কবিতার ছন্দে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। 'মঙ্গলকাব্য' নামকরণ নিয়ে বিবিধ মতামত লক্ষণীয়। এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের মতে এগুলি শুনলে মঙ্গল হয়, তাই এর নাম মঙ্গলকাব্য। কিছু পণ্ডিতের মতে এক মঙ্গল থেকে শুরু করে পরের মঙ্গল পর্যন্ত এগুলির গীত হয় বলে একে মঙ্গলকাব্য বলা হয়। নামকরণ নিয়ে মতভেদ থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে মঙ্গলকাব্য যখন লোককথা হিসেবে সমাজে প্রচলিত ছিল তৎকালীন সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট যেমন কাহিনীগুলিতে বর্ণিত ছিল, ঠিক তেমনি পরবর্তীকালে সেগুলি যখন লিপিবদ্ধ করা হল তখন যে সময়ে যে কবি সেগুলি লিখেছিলেন মূল কাহিনীর সাথে তাঁর সমসাময়িক সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক চিত্র তাঁরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলির দিকে নজর করলেই বোঝা যায় তা শুধু দেবদেবী কেন্দ্রিক নয়, তা কিছু পরিমাণে মানুষের জীবনযাত্রার রূপকে আকৃতি প্রদান করেছে। এইরূপ একটি মঙ্গলকাব্য হল 'মনসামঙ্গল কাব্য'। মূলত মনসার মর্ত্যে পুজো প্রচলনকে কেন্দ্র করে এই কাব্যটি গড়ে উঠেছে। এই কাব্যটি না পড়লেও গল্পটির কথা জানেনা বাংলায় এমন মানুষ বোধ হয় খুব কমই দেখা যায়। ছোটবেলায় প্রথমে ঠাকুমার মুখে দেবী মনসার পুজো প্রচলনের গল্প, বর্ষার দিনে অন্ধকার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে শুনতে বেশ উপভোগই করেছিলাম। গল্পের মতোই শুনেছিলাম তখন, আবার কখন ভুলেও গেছি নিজেরও মনে পড়ে না। তারপর কোনো ধারাবাহিকে বা চলচ্চিত্রে দেখলেও মনোযোগ প্রদান করার প্রয়োজন বোধ করিনি কখনও। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যের বিষয়ে পড়েছি ঠিকই, তবে তা শুধুই পড়ার জন্য পড়া - এই কথা অস্বীকার করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনোটাই আমার নেই। তবে পরবর্তীকালে নৃত্য নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার সুবাদে দেখি যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নৃত্যের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু জ্ঞান অর্জন করা। সাহিত্য থেকে যে ইতিহাসের কিছু রসদ জোগান হয়, সে বিষয়ে সকলেই অবগত। নৃত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হয় না। সাহিত্যে নৃত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে বেদ, ভাগবত পুরাণ, হরিবংশ পুরাণ, শিলাপ্পাদিকরম, বাল্মীকি রামায়াণ, বেদব্যাস রচিত মহাভারত ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও, বাংলাসাহিত্যে নৃত্যের উল্লেখ প্রসঙ্গে ততটা ওয়াকিবহল হইনি কোনোদিনও। সেই প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করতে করতেই মঙ্গলকাব্য বিষয়ে আসা। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে নৃত্যের প্রসঙ্গ বিষয়ে পাড়ি দিতে গিয়ে বুঝি, 'নৃত্য' যা একসময়ে বাংলা শুধু নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে নিন্দনীয় বিষয় ছিল, যা শুধুমাত্র নিম্নশ্রেণীর নারীদের পেশা হিসেবে বিবেচিত ছিল, পূর্বে তার স্থান ছিল দেবলোকে এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে নৃত্য করতেন। মনসামঙ্গল কাব্যে নৃত্য বিষয়ক উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলি আলোচনা করলে আমরা মোটামুটি এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা পেতে সক্ষম হই।

বিজয়গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে 'যমযুদ্ধ পালা' এ আমরা দেখতে পাই যে আনিরুদ্ধ ও ঊষা যখন নিজেদের মধ্যে সনকার ছয়পুত্র হারানোর শোক নিয়ে কথা বলছে বা নিজেদের মর্ত্যে জন্মানোর ইচ্ছা প্রকাশ করছে তার কিছু পরেই উল্লেখিত আছে যে এই দু'জনেই নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 64 - 69
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"নৃত্য করে অনিরুদ্ধ আনন্দিত মন।
কুবের বরুণ আসিল দেব পুরন্দর।
নৃত্য দেখিতে আসিল যত দেবগণ।"[২]

এখানে নৃত্য শুধু দেবলোকে পরিবেশিত হয়েছে তা নয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রদেব, মহাদেব, কুবের, বরুণ সমস্ত দেব্দেবতারা নৃত্য বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন সে বিষয়ও স্পষ্ট হওয়া যায়।

নৃত্য শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হত তা নয়, নৃত্য বিষয়টি দেবগণ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে দেখতেন সে বিষয়ে সন্দেহর অবকাশ থাকে না। কাব্যে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, মহাদেব মনোযোগ সহকারে নৃত্য উপভোগ করছিলেন। মনসার ছলে নৃত্যের তাল ভঙ্গ হলে অনিরুদ্ধ এবং ঊষা মহাদেবের প্রকোপে পড়েছিলেন এবং তার দরুণ মর্ত্যে মনুষ্য যোনি থেকে জন্মলাভ করার শাপ পেয়েছিলেন।

"নৃত্য করিতে গেল শিব বিদ্যমান।
নৃত্য দেখিতে আসে যত দেবগণ।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি আসিল সত্বর।
এক দৃষ্টে নৃত্য চাহেন দেব ত্রিলোচন।।
...
বিষজ্বালে কাঁপে ঊষার সকল শরীর।
দেখিয়া কুপিত হইল দেব ত্রিলোচন।।
কেহবা বুড়ার পুত্র কেহবা ঝিয়ারী।
আমার আগে নৃত্য করিতে বাস ঘৃণা।
আমারে ভাবিস তোরা অজ্ঞান পাগল।
ভুজিয়া পরম সুখ বিবিধ বিধানে।
মনুষ্য যোনি জন্ম লও তোমরা দুইজনে।।"[৩]

পরবর্তীতে মর্ত্যে অনিরুদ্ধ, লখীন্দর নামে এবং ঊষা, বেহুলা নামে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। চাঁদ সদাগরের পুত্র লখীন্দরের বিবাহের রাতে সর্পদংশণে প্রাণ গেলে, বেহুলা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় দেবলোকে যাত্রা করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার। ভেলায় করে স্বামীর নিথর দেহ নিয়ে যাওয়ার সময়ে যাত্রাপথে নেতার সাথে কথোপকথনের সময়ে নেতা বলেন যে, নৃত্য মহাদেবের বড়ই প্রিয়। তাই নৃত্যগীতে শিবকে সন্তুষ্ট করার কথা তিনি বলেছেন।

"পদ্মার বাড়ির পূবে মহাদেবের পুরী।
আপনি নর্তক গোসাঞি নৃত্য ভালোবাসে
...
নিরন্তর থাকে তথা হর আর গৌরী।।
নৃত্য করি বর মাগো যেবা মনে আসে।।
নৃত্যগীতে তুমি তারে মাগি লয় বর।।
নাট্যশালায় আছে তার গোটা দুই মৃদঙ্গ।।
তার এক মৃদঙ্গ লুকাইয়া দিব তোরে।।"[৪]

অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বাদ্য তিনটির সমাবেশই একসময় বাংলার বুকে প্রচলিত ছিল শুধু তাই নয় তার যথাযথ সম্মানও ছিল। নচেৎ কাব্যে নৃত্যের সঙ্গে দেবতাদের সম্পর্ক স্থাপণ করার ধৃষ্টতা কেউ দেখাতো বলে মনে হয় না। এরপর 'ভাসান পালা'-এ বেহুলার দেবসভায় নৃত্য প্রদর্শনের চিত্র আমরা লক্ষ্য করি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 64 - 69
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"মুখে গায় গীত বেহুলা পায় ধরে তাল।
নৃত্যগীতে শূলপাণি হইল মোহিত।
...
বামপাশে বসিয়াছেন জগত গৌরী মাই।।
দূরে থাকি বেহুলা নোয়াইল মাথা।।
মৃদঙ্গেতে ঘা দিয়া আরম্ভে কীর্তন।।
মৃদঙ্গ বাজাইয়া গীত গায় মধুর স্বরে।।
উচ্চৈঃস্বরে গাহে গীত যেমন কোকিল।।
কোন জনে গাহে গীত শুনিতে রসাল।।
ততদিন নাহি শুনি হেন রাগ ভাষা।।
...
বিদ্যাধরী হইতে কন্যা নাচে গায় ভাল।।
কোটি মূল্য ধন দিয়া বাহিরে দাও বাসা।।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল।।"[৫]

বেহুলা একই সাথে নৃত্য করছেন, গান গাইছেন এবং তার তালে তালে মৃদঙ্গও বাজাচ্ছেন। মনসামঙ্গল কাব্যে নৃত্যগীতের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আমরা পরিলক্ষিত করি। নৃত্যে তাল ভঙ্গ হয়ে অনিরুদ্ধ, ঊষা মর্ত্যে মনুষ্য রূপ ধরে জন্ম নিচ্ছেন আবার নৃত্যে মহাদেবকে প্রসন্ন করে তিনি তাঁর স্বামীকে ফিরিয়ে আনছেন অর্থাৎ 'নৃত্য'-কে কেন্দ্র করে ঘটনাগুলি তার রূপ পাচ্ছে। কোনো বিষয় যদি সমাজে বঞ্চিত হয় বা অবজ্ঞার বিষয় হয় তবে সেই বিষয়টির স্থান কোনো কাব্যে সেই রূপেই প্রস্ফুটিত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নৃত্য মর্যাদার আসন গ্রহণ করেছে শুধু নয়, নৃত্যগীতবাদ্যে পটু হলে তা রীতিমত একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় গুণ রূপে গ্রাহ্য হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মৃতির গোড়ায় খানিক হাওয়া দিলে মনে পড়ে যে স্কুলজীবনে জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা পড়েছিলাম 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' নামক। এই কবিতাটিতে তিনি 'ছিন্ন খঞ্জনার' সাথে বেহুলার নৃত্যের তুলনা করেছেন।

"...বেহুলাও একদিন গাঙরের জলে ভেলা নিয়ে-
কৃষ্ণা - দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায় -
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল - একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মত যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ-ভাঁটফুল ঘুঙুরের মত তার কেঁদেছিল পায়।"[৬]

অর্থাৎ কবিতাটিতে বলা হয়েছে যে, বেহুলার আহত মন, ক্লান্ত শরীর কিন্তু তাতেও তিনি হার মানেন নি। তার ঘুঙুরের শব্দে সেদিন তাঁর মনের যে বেদনা প্রকাশ পেয়েছিল সেই বেদনার সুরে সমগ্র বাংলা কেঁদে উঠেছিল। মধ্যযুগের কবি বিজয়গুপ্ত যেমন তাঁর লেখনীতে 'নৃত্য' কে সমাজের এক উল্লেখযোগ্য স্থানে বসিয়েছিলেন, আধুনিক যুগের কবি জীবনানন্দ দাশ নৃত্যের সত্ত্বাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। নৃত্য শুধু দেহের অঙ্গভঙ্গি নয়, নৃত্যের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল ভাবের প্রকাশ। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতার মাধ্যমে বাংলার সৌন্দর্য বিবরণ করেছেন তা নয়, নৃত্যের মাধ্যমে যে ভাবগুলি প্রস্ফুটিত হয় যা দর্শকের মনে রসসঞ্চার করে সেই মতবাদটিকেও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ এক সময়ের ব্রাত্যশিল্প বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে উঠে এসেছিল লেখকদের মনে, তাঁদের লেখনীতে। তবে সে বিষয়ে চর্চা করতে হলে আমাদের লেখার বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে যেতে হয়। তাই গণ্ডির মধ্যে থেকে এবারে আসাযাক বাংলা সাহিত্যের আর এক গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গলকাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল' এর কথায়ে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 64 - 69
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কবি মকুন্দ চক্রবর্তী (কবিকঙ্কণ) এর লেখা এই কাব্যে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য, তাঁর শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনীটি প্রধানত দুটি মূলভাগে বিভক্ত। একটি 'কালকেতু উপাখ্যান' এবং অন্যটি হল - 'ধনপতি-শ্রীমন্ত উপাখ্যান'। 'কালকেতু উপাখ্যান' এ আমরা দেখতে পাই যে যখন ভারুদত্ত কলিঙ্গরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে ক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে গুজরাট নগরীর বর্ণনা দিচ্ছেন তখন তিনি বলছেন, -

"শঙ্খ বেনি বীণা ভেরি ভরে নানা
বাদ্য বাজে ঘরে ঘরে
হএ নাটগীতে দেখি ঘর ভিতে
মঙ্গল প্রতি বাসরে।"[৭]

আবার কলিঙ্গরাজ যখন বর্ণনার সত্যতা যাচাই করার জন্য গুজরাট নগরীতে লোক পাঠাচ্ছেন তখন নগরী প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি উল্লেখ করেছেন যে, -

"প্রতিঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দ্বীপ জ্বলে
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বেনি
কাঁসর দুন্দুভি পড়া জগঝম্প বাজে জোড়া
মৃদঙ্গ বল্লকি বাজে সানি
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কক্ষা মালের মালম শিক্ষা
তাল নাট গীতের বাখান
লইআ বাসুলি-পাতা দেয়াসিন চালে মাথা
বাদ্যা রোজা পড়য়ে ঝাঁপান।
আশ্রম চত্বর স্থল কেহ পাশা বুদ্ধি বল
গুণিজন ভাসে গীতনাটে
রাম জেন বীর রাজা রঙ্ক দুঃখি নাহি প্রজা
কোন চিন্তা নাঞি গুজরাটে।"[৮]

এখানে উল্লেখ্য এই যে - নগরীর সুখসমৃদ্ধির বিবরণ দিতে গিয়ে কবি যেমন নৃত্যগীতবাদ্যের কথা বলেছেন তেমনি, এই শিল্পকলার সাথে সমাজের গুণি মানুষেরা যুক্ত থাকে সেই বিষয়ও স্পষ্ট করেছেন।

পরবর্তীতে কলিঙ্গরাজ যখন কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সেই দৃশ্য চিত্রায়িত করার সময় কবি বলছেন,

"বাজন নপুর পায় বীর মুড়্যা পাকি ধায়
রায়বাঁশ ধরে খরসান
শোলার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে
বাঁশে বান্ধে চামর নিশান।"[৯]

কবি এখানে যুদ্ধের তৎপরতা বোঝাতে গিয়ে রায়বেঁশে নৃত্যের উল্লেখ করেছেন। রায়বেঁশে হল একটি যুদ্ধ নৃত্য যা বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ। গুরুসদয় দত্তের মতে- ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রায়বাঁশে হিন্দু ও মুসলিম শাসকদের সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর, যেখানে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুর্শিদাবাদের নবাবের উপর নির্ণায়ক জয়লাভ করে, বাঙালি সৈনিক নিয়োগের প্রথা শেষ হয়ে যায়। তাঁর মতে, রায়বাঁশের মতো যোদ্ধা সম্প্রদায়কে স্থানীয় জমিদার, রাজা ও জমিদারদের কাছে তখন কাজের সন্ধান করতে হয়েছিল। এমনকি ক্রমে ১৮শ শতকের শেষের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 64 - 69
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিকে এই প্রথাও ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। যোদ্ধাদের যুদ্ধ সংক্রান্ত কৌশল তুলনামুলকভাবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়ায় তা নৃত্যরূপ ধারণ করে। আজও এই নৃত্য লোকনৃত্য হিসেবে, বাংলার যুদ্ধ নৃত্য হিসেবে বিরাজমান।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, নৃত্য বিষয়টি এক সময়ে সম্মানের সাথে সমাজে উচ্চ আসন লাভ করেছিল। নৃত্য হঠাৎ করে বাংলার বুকে আমদানি হওয়া কোন বস্তু নয়। বহু প্রাচীনকাল থেকে এর অস্তিত্ব বিভিন্ন লেখকরা, কবিরা তাদের বর্ণনায় বর্ণিত করে এসেছেন। কালের নিয়মে এই শিল্প উত্থান-পতন দুইয়ের-ই সাক্ষী বহন করেছে ঠিকই, তবে এর ব্যাপ্তি কখনই অবলুপ্ত হয়নি। তাই নৃত্যের ইতিহাসে বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির অবদান তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান দাবী করে।

Reference:

১. চক্রবর্তী কুনাল, রিলিজিয়াস প্রসেস : দ্য পুরাণাস অ্যান্ড দ্য মেকিং অফ আ রিজিওনাল ট্র্যাডিশন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১, পৃ. ১২০–১৪৫
২. বিশ্বাস অচিন্ত্য (সম্পাদিত), ‘মনসামঙ্গল’, বিজয়গুপ্ত, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম, প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ২০৮
৩. বিশ্বাস অচিন্ত্য (সম্পাদিত), ‘মনসামঙ্গল’, বিজয়গুপ্ত, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম, প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ২০৮-২০৯
৪. বিশ্বাস অচিন্ত্য (সম্পাদিত), ‘মনসামঙ্গল’, বিজয়গুপ্ত, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম, প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৩৩২
৫. বিশ্বাস অচিন্ত্য (সম্পাদিত), ‘মনসামঙ্গল’, বিজয়গুপ্ত, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম, প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৩৩৩
৬. দাশ জীবনানন্দ, বাংলার মুখ - Jibanananda Das - Bangla Kobita - বাংলা কবিতা, কবি ও কবিতার বাংলা পোর্টাল
৭. সেন সুকুমার (সম্পাদিত), ‘চণ্ডীমঙ্গল’, চক্রবর্তী, মুকুন্দ, সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৮৭
৮. সেন সুকুমার (সম্পাদিত), ‘চণ্ডীমঙ্গল’, চক্রবর্তী, মুকুন্দ, সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৮৭
৯. সেন সুকুমার (সম্পাদিত), ‘চণ্ডীমঙ্গল’, চক্রবর্তী, মুকুন্দ, সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৮৮